জঙ্গলমহলের লোকসঙ্গীতে সমাজ চেতনার ধারা

জলধর কর্মকার

বহু ভাঙাগড়া, ঘাত-প্রতিঘাত, উত্থান-পতনের মধ্য দিয়েই রচিত হয় মানবসভ্যতার ইতিহাস। হিমালয় থেকেও প্রাচীন, লাল পোড়ামাটি আর পাহাড়শ্রেণি যার অঙ্গভূষণ; যার বিচিত্র খনিজ ও অরণ্য সম্পদকে যুগ যুগ ধরে হরির লুঠ করেও শেষ করা যায় নি এই জঙ্গল এলাকার মানুষও জীবন-জীবিকার প্রয়োজনে, অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামে, কভু জয় কভু পরাজয়ের মাধ্যমে রচনা করে চলেছেন ইতিহাস— যে কাহিনি আজও নিরালা বনমর্মরের মতো ভারতীয় নাগরিকদের কাছ থেকে বহু দূরে রয়ে গেছে।

মার্কণ্ডেয় পুরাণে জঙ্গল এলাকার চিরায়ত ঐতিহ্যের বর্ণনা মেলে। বৈদিক যুগে এই এলাকাকে বলা হয়েছে 'কালকাবন'। রামায়ণে বলা হয়েছে 'আটবিক দেশ'। ২০০০ বছর আগে এলাকাটি পরিচিত ছিল 'বজ্জভূমি' বা 'বজ্রভূমি' নামে। জৈনদের পবিত্র গ্রন্থ - 'আচারঙ্গসূত্তে' এই এলাকার বর্ণনা মেলে। ২৪তম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীর এই এলাকা ভ্রমণ করেছিলেন। কাঁসাই নদীর তীরে তীরে রালিবেড়া, বুধপুর প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধমঠ আর জৈন স্থাপত্যের ছড়াছড়ি।

পাহাড়ি উপত্যকা এবং অজস্র নদীনালা ঝরনা ধারাবেষ্টিত এই দুর্গম অঞ্চলে হিন্দু এবং মুসলিম সাম্রাজ্যবাদীরা বার বার হানা দিয়েও এখানকার ঐতিহ্যকে বিনষ্ট করতে পারেনি। শেরশাহ, সম্রাট আকবর এবং তাঁর উত্তরসুরিয়া বহুবার চেষ্টা করেও এই এলাকাকে নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেননি। ১৭৬৭-১৭৯৯ পর্যন্ত মুহুর্মুহু চুয়াড় বিদ্রোহে ভীত ব্রিটিশ সরকার জঙ্গল এলাকায় প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য ১৮০৫ সালে ১৮নং ধারা অনুযায়ী বীরভুম, বর্ধমান এবং মেদিনীপুর জেলা থেকে বিভিন্ন স্থান নিয়ে গঠন করেছিল 'জঙ্গলমহল' জেলা। মেদিনীপুরের কালেক্টার এডওয়ার্ড বেরার তৎকালীন গভর্ণর ওয়ারেন হেস্টিংসকে জানিয়েছিলেন— "পশ্চিমের জঙ্গল এলাকা লম্বায় ৮০ মাইল এবং চওড়া ৬০ মাইল। পূর্বে মেদনীপুর, পশ্চিমে সিংভূম, উত্তরে পাঁচেট ও দক্ষিণে ময়ুরভঞ্জ।"

নদীনালার তীরবর্তী অঞ্চলে তথা পাহাড় পর্বতের কোলে আবহমানকাল ধরে এই এলাকার ভূমিজ, মুন্ডা, লোধা, শবর, কোল, কুড়মি, বিরহড়, সাঁওতাল প্রভৃতি আদিবাসী জাতি-জনগোষ্ঠীর মানুষের জীবনাচরণের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে লোকশিল্পের

এক অফুরন্ত ভান্ডার। টুসু, ভাদু, ঝুমুর, অহিরা, জাওয়া-করম, বাঁদনা, বাহা, সহরায়, পাতা, ছাতা, দঙ, লাঙড়ে শুধু রিঝে রঙে মাতামাতির উপাদানই নয় খরা-বন্যায় অভাবক্লিষ্ট জীবনে বেঁচে থাকার রসদ সংগ্রহে এবং বিদেশি সাম্রাজ্যবাদের শোষণ, শাসন, অন্যায়, অবিচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে সাহায্য করেছে এই সম্পদ। চুয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, নীল বিদ্রোহ এবং পরবর্তীকালে ভাষা আন্দোলনের সময়কালে রচিত বিভিন্ন ঝুমুর, টুসু, সাঁওতালি গান শাণিত হাতিয়ারের কাজ করে। বাংলাদেশের সঙ্গীতে, সাহিত্যে জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয় যখন হয়নি তখন এই এলাকার আদিবাসীরাই বন পাহাড়তলি থেকে পিপিলিকার মতো বেরিয়ে হাজার হাজার মানুষের অন্তহীন মিছিলে পা মিলিয়েছিল বিদ্রোহের মাদল বাজাতে বাজাতে। সেদিন তাদের হাতে যেমন ছিল শাণিত হাতিয়ার, মুখে ছিল ঝুমুর টুসুর সুর ঝংকার — যা ছিল যে কোন অস্ত্রের চেয়েও ভয়ংকর।

পশ্চিম সীমান্ত রাঢ়বঙ্গের এমনই এক জনপ্রিয় লোকগান হল ঝুমুর। ঁ কবি কৃত্তিবাস কর্মকারের ভাষায়—

"রাঁধনাশালে গুনগুনালে রাঁধুনি নুন দিতে ভুলে যায়
ও ঝুমর‍্যা ভাই;
তোর ঝুমরের সুর বুঝা দায়।"

এই হল এখানকার ঝুমুরের আবেদন। জঙ্গলমহলের সর্ববৃহৎ লোকআঙ্গিক ঝুমুর ও টুসুগানে লুক্কায়িত আছে এই অঞ্চলে রচিত বহু পবিত্র হলদিঘাটের স্মৃতিকথা। সমসাময়িক ঝুমুর পদকর্তা ও কবিদের লেখনীতে ও গানে আলোচ্য সময়কালের রাজনৈতিক, সামাজিক সমস্যা, দারিদ্র, ক্ষুধা সবকিছুই ধরা পড়েছে।

আমরা সকলে জানি ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৪ অর্থাৎ পলাশী থেকে বক্সার পর্যন্ত ব্রিটিশ সুবা বাংলায় প্রথম রাজনৈতিক আধিপত্য কায়েম করেছে। "বণিকের মানদন্ড রাজদন্ডরূপে" প্রতিভাত হয়েছে। ১৭৬৫ সালে তারা পেয়েছে দেওয়ানীর অধিকার। ১৭৬০ সালে মীরকাশিম বাংলার মসনদের বিনিময়ে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে ২৬ লক্ষ টাকা এবং বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টোগ্রামের জমিদারি দিয়ে দেওয়ায় জঙ্গল এলাকা ব্রিটিশ পরাধীনে আসে। ১৭৬৭ সাল থেকেই জঙ্গলমহল এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন সামন্ত রাজা, জমিদাররা এগিয়ে আসেন ভূমি রক্ষার লড়াইয়ে। ইংরেজরা এ দেশিয়দের এই লড়াইকে ছোট করার জন্য 'চুয়াড় বিদ্রোহ', নেটিভ-বর্বরদের অভ্যুত্থান বলে আখ্যা দিলেও এই সংগ্রামগুলি ব্রিটিশ বিরোধী প্রতিবাদ প্রতিরোধ আন্দোলনের একেকটি গণসংগ্রাম। চূয়াড় বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ প্রভৃতির পরিপ্রেক্ষিতেই জঙ্গল এলাকায় নিজেদের শাসনকে আরোও মজবুত করার জন্য ১৮০৫

সালের ১৮নং ধারা অনুযায়ী ব্রিটিশ গঠন করেছিল জঙ্গলমহল জেলা এবং ১৮৩৩ সালের ১৩নং ধারা অনুযায়ী মানভূম জেলা।

দলমা, পাঁচেৎ, রাকাপ্ জঙ্গলের ধারে ধারে কাঁসাই, নেঁংসাই, দামোদর, সুবর্ণরেখার তীরে তীরে সংগঠিত উপরোক্ত বহু হলদিঘাটের পবিত্র কাহিনি ধরা আছে ওই সময়কালে রচিত বিভিন্ন ঝুমুর গানে।

বরাভূমের বিদ্রোহী নেতা গঙ্গানারায়ণ সিংএর প্রধান সেনাপতি কিষণ সিং, বিসন সিং, জিলপালায়ার কথা আছে ঝুমুর গানে।

হাঁসা রাজা কাঁসা সিং জুড়ল বিসন সিং
এ গো মানভূঞে লাগল লড়াই—
মানভূঞে মরি গেল রাজা হে বিষন সিং
পাগড়ি আইল রে নিসান।
পাগড়ি দেখি রানী ভাঙে আম ডাল যে
পাগড়ি লয়ে সতী যাবে যে—।

প্রবল বিক্রমের কারণে দামপাড়ার নয়ান সিংকে ব্রিটিশ গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়ে ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বুকে টাড়া কাঠ-চাপা দিয়ে গ্রেপ্তার করে।

"বড় ভেদে গো নয়ান সিং-এর বুকে দিল টাড়া
দু নয়নে বহে ধারা....।"

বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের পটমদা থানার বড়াম এর কাছে রূপসান ডুংরির নিচে ১লা মাঘ তারিখে পূজা দেওয়ার সময় ভূমিজ পুরুষ মহিলা আদিবাসীর কণ্ঠে গানের আকারে নাচসহ এখনো গীত হয়—

"বিক্রমজিৎ রাজা ভেল
কলিত পড়ি গেল
ছাতা পখরি রাজার
ঘড়া ডুবি গেল।"

লক্ক লক লকই যে, লক আসছে লুকাও রে আও।
আগু দিগেও ভালবে রে, পেছু দিগেও ভালবে রে,
লক্ আসছে লুকাও রে, আও।"

১৭৬৫ সালে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী দেওয়ানির ক্ষমতা হস্তগত করার পরই ১৭৬৬ সালে মেদিনীপুরের তৎকালীন রেসিডেন্ট গ্রাহাম সাহেবের আদেশে লেফটেনান্ট ফার্গুসন সৈন্যসহ জঙ্গলমহল অধিকার করার জন্য অগ্রসর হন। প্রধানতঃ

চিয়াড়া, নয়াবাসন, বেলিয়াবেড়া, ঝাড়গ্রাম, জামবনি, শিলদা, চিলকিগড়, লালগড়, কল্যাণপুর ইত্যাদি জঙ্গলাকীর্ণ জায়গা ছিল চুয়াড় বিদ্রোহীদের ঘাঁটি। ব্রিটিশদের সাথে যুদ্ধে ঝাড়গ্রামের রাধানগর দুর্গেরপর ঝাঁটিবনি দুর্গেরও পতন ঘটল। বাঁধগড়াতে হোল প্রচন্ড সংগ্রাম। তথাপি ফার্গুসনের বশ্যতা স্বীকার করলেন না আদিবাসী সর্দার ও সামন্ত রাজারা। মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের রানি শিরোমণি, ঝাড়গ্রামের মল্লদেব, শিলদার মল্লরায়, জামবনি, চিলকিগড়, পঞ্চকোট, ধলভূমগড় ও মানবাজারের ধবলদেব প্রমুখ রাজারা চুয়াড় বিদ্রোহীদের মদত দিয়েছিলেন। লোধা শবরদের নেতা কেশু হাড়িকে ফাঁসি দেওয়া হল। কারণ তিনিই প্রথম জঙ্গল কাটার বিরোধিতা করেছিলেন। শিলদা ও গনগনির মাঠে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম অনুষ্ঠিত হল। ক্যাপ্টেন ও কেসীর নির্দেশে গনগনির মাঠে দুর্ধর্ষ নায়েক বিদ্রোহের নায়ক অচল সিংকেও ফাঁসি দেওয়া হল। ক্লান্ত, অবসন্ন, আহত দেহে ধরা পড়লেন বহু নেতা। বাগ্‌দী-বাউরিদের নেতা গোবর্ধন দিকপতি ও মুন্ডা-ভূমিজদের নেতা নিমাই সর্দারের ফাঁসি হল। এইসব লড়াই সংগ্রামের কথা কালের করাল গতিতে এখন স্মৃতি হয়ে গেলেও জঙ্গলমহলের লোকগানে এখনো অনুরণিত হয় সেইসব বিরোচিত লড়াই-সংগ্রামের কথা।

হাঁসা রাজার ছত্রসিং, চড়ল অচল সিং
এহো মলভূঁঞে সাজল লড়াই।
গণগণী টাঁইড়ে, ফাঁসি হেঁল্যাঞ গোবর্দ্ধন
গোবর্দ্ধনের সঙ্গতি নিমাই।

চুয়াড় বিদ্রোহের সময়কালে রচিত ধলভূমের শবর নেতা কেহু হাড়ি ও রঘুনাথ মাহাতর ফাঁসি নিয়েও রয়েছে গান—

কেশু হাঁড়ির ফাঁসি হো'ল
রঘুনাথ মাহাত বাঁধাঞ গেল
বাঁশ বনে ডম হো'ল কানা
রাগে জ্বলছে জঙ্গলমহল জেলা।

বরাভূমের চুয়াড় বিদ্রোহের নেতা গঙ্গানারায়ণ সিং এর নিয়েও রয়েছে গান—

গঙ্গানারায়ণ রাজাহে, দুলঅকি দুলঅকি
বুলি মাহাতঅ ঘোড়ারি সওয়ার
পাটাবাঁধা সিপাহী, বাঁধে লেগন ভাইরে
পাহাড়ের উপরে হল যে লড়াই।

১৮৩২ সালে চুয়াড় বিদ্রোহের এই দুধর্ষ নেতাকে জীবিত অথবা মৃত ধরিয়ে

দিতে ব্রিটিশ তার মাথার দাম ধার্য করেছিল ১ লক্ষ টাকা। জঙ্গলমহলের সর্ববৃহৎ অংশ ছিল বরাভূম। ১৫শ-১৬শ শতকে রচিত ভবিষ্যপুরাণের ব্রহ্মাণ্ডখণ্ডে 'বরাভূমির' উল্লেখ পাওয়া যায়। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে শুরু হলেও এই বিদ্রোহ ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের এক বড় অধ্যায়। বর্তমান ঝাড়খণ্ড রাজ্যের নিমডি থানার বামনির অদূরে নাকটিথান নামক জায়গায় ইংরেজ মদতপুষ্ট মাধব সিংকে হত্যা করার পরই জ্বলে উঠেছিল বিদ্রোহের আগুন। ১৮৩২ এর ১লা মে তাঁর অনুগামীদের নিয়ে গঙ্গা নারায়ণ সিং বরাবাজারের মুনসিফ কাছাড়ি লুঠ করেন, কোর্ট জ্বালিয়ে দেন এবং বাজারে লুঠতরাজ চালানো হয়। এরপরই ১৪ই মে তারিখে গঙ্গানারায়ণের নেতৃত্বে বিরাট বাহিনী বরাবাজারে ইংরোজদের ক্যাম্পের দিকে এগোতে থাকে। হাতে তাদের উন্মুক্ত তরবারি, টাঙি, ফারসা নাচাতে নাচাতে, ঢোল, ধামসার গুরু গম্ভীর আওয়াজের সাথে মুখে ঝুমুর গান। ম্যাকডোনাল্ড তাঁর বাহিনী নিয়ে সাময়িকভাবে বিদ্রোহীদের ছন্নছাড়া করলেও তাদের পিছু হটানো যায় নি। বাঁধডি, কুইয়ানি, বামনি, সামানপুর, বেড়মা, বড়চাতরমা, আদাড্ডি, আগইডাঙ্গরা প্রভৃতি জায়গায় অনুষ্ঠিত হয় খন্ডযুদ্ধ। রায়ডি-বেড়াদাতে ঘাঁটি স্থাপন করে ব্রিটিশ বাহিনী বিদ্রোহ মোকাবিলার চেষ্টা করে। ১৮৩২ এর সারা ডিসেম্বর মাস ধরে রায়ডি, দিগারডি, বেড়্যাডি, বেড়াদা প্রভৃতি জায়গায় চলতে থাকে ব্রিটিশ তান্ডব। বিদ্রোহীরা সম্মুখযুদ্ধে না গিয়ে গেরিলা আক্রমণে ব্রিটিশ ফৌজকে ব্যতিব্যস্ত করে তোলে। পাহাড়ের গোপন স্থান থেকে শন শন করে ঝাঁকে ঝাঁকে ছুটে আসা বিষমাখা তীর ইংরেজ বাহিনীকে সন্ত্রস্ত করে তুলে। ব্রিটিশ ফৌজের জন্য আনীত সমস্ত খাদ্য দ্রব্যও রাস্তায় লুঠ হয়ে যাচ্ছিল। রাসেল এবং লেফটেনান্ট কর্ণেল কুপার এর নেতৃত্বে ৫০ রেজিমেন্টের দল বাঁধডি আক্রমণ করতে এসেও ব্যর্থ হয়। প্রলোভন দিয়ে অন্যান্য ঘাটোয়ালদের মন জয় করার সমস্ত ব্রিটিশ পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়।

প্রথম অভিযানে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হয়ে পরে অবশ্য দ্বিতীয় দফার প্রস্তুতি নিয়ে ব্রাডন, যুগ্ম কমিশনার W. Dent, T. Wilkinson প্রমুখের সুপরিকল্পিত আক্রমণে বিদ্রোহীরা বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপনে বাধ্য হন। ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত যথাসম্ভব জোরদার ব্রিটিশ আক্রমণ চলে। সমস্ত শক্তি নিয়োগ করে ইংরেজ বাহিনী দলমা পাহাড়কে ঘিরে রাখে। লাড়কা কোলদের সাহায্য লাভের আশায় গঙ্গানারায়ণ চোরাপথে রাতের অন্ধকারে সিংভূমের দিকে ঘোড়া ছুটিয়ে পালিয়ে যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে ব্রিটিশ মদতপুষ্ট খরসোয়ানের ঠাকুর চেতন সিং এর দ্বারা হিন্দু সহর থানা এলাকায় তিনি নিহত হন। গঙ্গানারায়ণ সম্পর্কে ইংরেজরা এতই ভীত ছিল যে তাঁর জামাতা এবং আত্মীয়সহ অন্ততঃ একশত জন লোককে দিয়ে তারা গঙ্গানারায়ণেরর ছিন্ন মস্তকটি সনাক্ত করান। মরতে মরতেও

গঙ্গানারায়ণ একাকী ঠাকুর চেতন সিং এর তিনজন লোককে হত্যা করেন এবং ৩০ জনকে ঘায়েল করেন। এই বীরত্বের কারণে পাতকুমের লোকেরা তাঁকে ডাকতেন "সিংহাসুর" নামে।

১৮৫৭ সালে পঞ্চকোটের মহারাজা নীলমনি সিং কেশরগড়ের রাকাপ এলাকার প্রায় দশ হাজার সাঁওতালকে সংগঠিত করে পুরুলিয়াকে দেড় মাস ধরে ব্রিটিশ মুক্ত রেখেছিলেন। সিপাহি বিদ্রোহের সময়কালীন ঘটনা ধরা রয়েছে ঝুমুরগানে।

হায় একি হইল, সিপাই পল্টন খেপিল
চারদিকে মার মার কাট কাট
যত সিপাই খেপেছে
কাশীপুরের মহারাজা
মহল ছাড়্যে আইসেছে।

জঙ্গলমহলের বহু লোকগানে, টুসুসঙ্গীতে সাবলীল ভঙ্গীতে জয়চণ্ডী পাহাড়তলির বিস্তীর্ণ এলাকার মকর পরবের সময় এখনো শুনতে পাওয়া যায়—

একটা ঝিঙা দুটা ঝিঙা, তিনটা ঝিঙার বেসাতি
ভাল করে রাঁধবি বহু, দাদা যাবেক কাছারি
কাছারিকে গেলেন দাদা, মকদ্দমার কি হো'ল?
মকদ্দমায় ডিগ্রী কর‍্যে নীলমণি বাঁধাঞ গেল।

কিংবা

উপরে পাটা তলে পাটা, মধ্যখানে দারোগা,
এ দারোগা সরাঁঞ দাঁড়া, টুসু যাবেক কইলকাতা।
কইলকাতাকে গেলে টুসু, মকদ্দমার কি হোল,
মকদ্দমায় ডিগ্রী ক'র‍্যে নীলমণি বাঁধাঞ গেল।

কে এই নীলমণি? পঞ্চকোট রাজপরিবারের এই বিদ্রোহী নেতাই ১৮৫৭ সালের লড়াই এর দিনে রাকাব্ এলাকার প্রায় দশ হাজার সাঁওতালকে সংগঠিত করে পুরুলিয়া জেলায় বিদ্রোহের আগুন জ্বেলে ছিলেন।

নীলকর সাহেবদের লাভজনক নীল চাষে অবাধ্য হলে চাষীদের ভাগ্যে জুটত অকথ্য অত্যাচার। চামু কামারের গানে ধরা রয়েছে সেই নীল চাষের গান।

১) লাল সুতা নীল সুতা চরখায় কাটিলাম সুতা
বুনাইলম লীল গামছা
সে গামছা হারালি কথায় সজনি

রং — ওগো লীলমনি - গামছা ধরিয়ে করে টানাটানি।
২) ত্রিকুনে বেগুনের বাড়ি - বেগুন বিকে নিলম শাড়ি
সে শাড়ি হারালি কথায় সজনি.... (রং)
৩) পাহাড় ধারে করি চাষ- ভাবনা বার মাস
বিদেশী ময়ূরে খাল্য ধান সজনি... (রং)
৪) চাষ করিলাম সোনা - খাইল বিদেশী ময়না
তখন চামু বলে ত্যজিব পরাণে। (রং)

ব্রিটিশ আমলে চা বাগানে কিংবা আফ্রিকার মরিশাসে কিংবা তুরস্কে খনিতে মাল উত্তোলনের জন্য মানভূম, ধলভূম, উড়িষ্যা এলাকার হাজার হাজার দরিদ্র মানুষকে কুলি হিসেবে একসময় চালান দেওয়া হয়েছে দূর দূরান্তে। কুলি চালানোর ঐ করুন কাহিনি বিধৃত হয়েছে ঝুমুর গানে।

১) চাটি চুটি দিয়ে মোরে
সাম করাইল্য ডিপু ঘরে বঁধুহে
লেখাঞ লিল আমার সাত পুরুষের নাম
।। রং।। হায় রে লম্পট্যা শ্যাম
ফাঁকি দিঞে বঁধু চালালি আসাম।
২) আমি যখন ডিপুঘরে গাড়ি তখন ফটক ধারে
গাড়ির ধুঙা দেখে আমার উড়িল পরাণ। (রং)
৩) মনে ছিল আসাম যাব জড়া পাঙ্খা টাঙ্গাইব
সাহেব দিল আমায় কদালেরি কাম। (রং)
৪) আমরা দু মা বিটি দিনে রাইতে চা কুঁটি
কুঁটিতে কুঁটিতে বহে ঘাম। (রং)
৫) অধম দীননাথ ভনে যে যাবে ভাই আসাম বনে
আর না ফিরিবে নিজধাম। (রং)

এককালের খরা, জরা, যন্ত্রণার কথাও স্থান পেয়েছে আধুনিককালের বিখ্যাত পদকর্তা মিহিরলাল সিংদেও মহাশয়ের ঝুমুরগানে।

১) গরীব হওয়া বেড়ে জ্বালারে ও ভাই পারি না সহিতে
ভখের জ্বালায় ছেইলা কাঁদে উঠিতে বসিতে
(রং) ও ভাই পারি না সহিতে।
২) পিঁধা ট্যানা গটাই ফাটারে লাজে পারি নাই বাহিরাতে

ছিঁড়া কাঁথায় জাড় ঢুকে কুঁকড়ে থাকি রাইতে। (রং)
৩) ছানাপনা রাত কানারে ওভাই হাতড়াঞ বুলে রাইতে
কি করে ডাক্তার দেখাব কানা কড়ি নাই হাতে।
৪) ইহ জ্বালা কিসে যাবে রে ওভাই পারি না বুঝিতে
আগাঞে দাঁড়াতে হবেক সমাজের মাথাতে। (রং)

দ্বিজ গদাধরের ঝুমুরেও রয়েছে মানুষের অভাব যন্ত্রনার কথা—

১) পরের ঘরে পর খাটালি সকাল হলেই যাই বাগালি
খাটিতে খাটিতে বহে ঘাম
(রং) কেইসে বাঁচে প্রাণ সাঁঝে খাইলে সকালে হয় টান।
২) যা ছিল গুঁড়ি বাড়ি সবই লিল লোইখা সুঁড়ি
এখন আ'ড়ে বইসে বহে দুনয়ন। (রং)
৩) লুয়াগড়ের কুটুম আইল্য খাওয়া দাওয়া সটে গেল
মাড়ে ভাতে রাখিল মান। (রং)
৪) দ্বিজ গদাধরে বলে কুকুরের লেখেন মানুষ মরে
ইয়াকালে কি যে হবেক জানে ভগবান। (রং)

তৎকালীন বাংলার বিস্তীর্ণ এলাকায় লাভজনক নীলচাষ করাতে গিয়ে নীলকর সাহেবদের যে অবর্ণনীয় অত্যাচার তার বিরুদ্ধে প্রথম থেকেই সরব ছিলেন জঙ্গলমহল এলাকার মানুষ। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, যশোর, খুলনা প্রভৃতি এলাকাতে আনুমানিক ৩০০০ নীলকুঠিতে এই সময়কালে এই এলাকা থেকে শ্রমিক চালান দেওয়া তো হয়েইছিল একই সাথে বরাভূম পরগনার বেড়াদা, বেলপাহাড়ি, শিলদা, মানবাজারের বরো থানার নলকুঁড়ি প্রভৃতি গ্রামে বসেছিল নীলকুঠি। পুরুলিয়া শহরের নীলকুঠিডাঙ্গা, রায়ডি-বেড়দার কুঠিটাঁড় প্রভৃতি নামকরণ আজও বহন করে চলেছে নীলচাষের স্মৃতি। বর্তমান নিমডি (ঝাড়খণ্ড রাজ্য) থানার বাড়েদা গ্রামের জিলপালায়া নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধ করে প্রতিবাদ করেছিলেন বলেই ঘুমন্ত অবস্থায় তাঁর বুকে সাঁঘাকাঠ চাপা দিয়ে তাঁকে গ্রেপ্তার করে মারতে মারতে এনে বেড়াদার নীলকুঠিতে ফাঁসি দেওয়া হয়েছিল। ১৯৮৩ সালে পশ্চিমবাংলার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত জ্যোতি বসু বেড়াদার এই নীলকুঠির সন্নিকটে শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ উন্মোচন করেন। সুলভ সমাচার, দিগ্‌দর্শন কিংবা দীনবন্ধু মিত্রের নীলদর্পণ নাটকের মতো না হোক তথাপি জঙ্গল এলাকার মানুষ ১৮৫৯-৬০ সালের বহুপূর্বেই ১৮৩০-৩২ সাল থেকেই নীলকর সাহেবদের জুলুমবাজির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধ রচনা করেছিলেন। এই এলাকার ঝুমুর, টুসু প্রভৃতি গানের

মধ্য দিয়ে নীলচাষের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করা হয়েছিল এক অপূর্ব উন্মাদনা। সেই সময়কালে রচিত গানে রয়েছে তার প্রমাণ—

শালুক লাড়ার আঁঠার দড়ি
হাল ধরতেই পড়্যে মরি
বাবুর মাঁঞ বাবুর মাঁঞ
আজ হামকে ভখ্যেই মরালি
নীল লো'টা কা'ট্যে কা'ট্যে
হাথ গেল ফাট্যে হে
বাবুর বাপ্ বাবুর বাপ্
দেন টুকু কাঁচা হল্যদ বাঁটে।
দাদন ফেলঅঁ হপকি সাহেব
দশ টাকা লেঁই হে
মহাজনকে বহাল ক্ষেতে
করি নীলচাষ হে।

টুসু সঙ্গীতেও রয়েছে নীলকর সাহেবদের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ - প্রতিরোধের কথা।

গোপাল মাহাতঅ বেড়ে রাগী
লাগড়াই পিটিল খাড়ি
লিল চাষ উঠাঁঞ দিল
বিশ্বনাথ সরদারে হে
সে তো ডিবার আলো
বিটি ছ্যালার কুলহি বুলা লয় ভালো।

কেবলমাত্র ঝুমুর বা টুসু সঙ্গীতেই নয় ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীতে জঙ্গলমহলের প্রতি গ্রামে যে জাওয়া ও করম উৎসব হয় সেই করম গানে এখনও ধ্বনিত হয় নীলচাষের প্রতিবাদী সুর।

সুন্দরবনের মাটি আড়ি, বুনল মঁঞ ধান
সেই ধান খাই গেলা মেজুরারে
নীলক্ষেতে ধান চাষ দেখবি তরা আয়
সেই ধান লেই গেলা মহাজনেরে।

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের চাপে ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্তকে ১৯১১ সালে রদ করতে বাধ্য হয়েছিল ব্রিটিশ। কিন্তু তৎকালীন মানভূমের ৭২ শতাংশ লোকের

ভাষা বাংলা হলেও শাসনতান্ত্রিক সুবিধার অজুহাতে মানভূমকে জুড়ে দেওয়া হয়েছিল বিহারের সাথে। বাংলাভাষীর হৃদয়ে জোর করে হিন্দী চাপিয়ে দিয়ে যত্রতত্র হিন্দী স্কুল নির্মিত হতে থাকলে প্রতিবাদে গর্জে উঠেছিলেন এখানকার মানুষ। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে (১৯০৫) বয়কট ও স্বদেশি আন্দোলনের সময়কালের চারণ কবিদের মতোই টুসু ও ঝুমুর গানের মাধ্যমে জঙ্গল এলাকার স্বেচ্ছাসেবক কর্মীরা বঙ্গভুক্তির প্রশ্নে গ্রামে গঞ্জে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন আন্দোলনের বার্তা। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের পর ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত এই ভাষা আন্দোলন তথা 'টুসু সত্যাগ্রহ' সমগ্র দেশে ঝড় তুলেছিল। নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এসেছিলেন লোকসেবক দলের সদস্য অতুলচন্দ্র ঘোষ, আশ্রমমাতা লাবণ্যপ্রভা ঘোষ, গিরিশ মাহাত, ভজহরি মাহাত প্রমুখ।

১৯৫৬ সালের ৬ই মে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার পুঞ্চার পাকবিড়রা থেকে সহস্রাধিক ভাষাপ্রেমী মানুষ পদব্রজে কলকাতায় আসেন টুসু, ঝুমুর গাইতে গাইতে। যে টুসুগানগুলি তখনকার দিনে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল—

"আমার বাংলা ভাষা প্রাণের ভাষা রে
(ও ভাই) মারবি তোরা কি তারে
বাংলা ভাষা রে।

এই ভাষাতেই পর্চা রেকর্ড
এই ভাষাতেই চেক কাটা
এই ভাষাতেই দলিল নথি
সাতপুরুষের হকপাটা।"

এই ভাষাতেই কাজ চলেছে
সাতপুরুষের আমলে
এই ভাষাতেই মায়ের কোলে
মুখ ফুটেছে মা বলে।
দেশের মানুষ ছাড়িস যদি
ভাগ্যের চির অধিকার
দেশের শাসন অচল হবে
ঘটবে দেশে অনাচার।

বিহার পুলিশের জুলুম এবং অত্যাচারের বিরুদ্ধে জেহাদও ঘোষিত হয়েছিল এই টুসু গানে।

"শুন বিহারি ভাই—
তোরা রাখতে লারবি ডাং দেখাঁঞ....।"

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি, লোকসেবক সংঘ এবং অন্যান্য সংগঠন ও বাংলা ভাষাপ্রেমী মানুষের এই লড়াই আন্দোলনের ফলশ্রুতিতেই ১৯৫৬ সালের ১লা নভেম্বর এতদিন থেকে বিহারে থাকা মানভূমকে ভেঙে তিন টুকরো করে পুরুলিয়াকে আনা হয় পশ্চিমবাংলার মধ্যে।

-ঃ সাঁওতালি জনজাগরণে লোকগানঃ-

প্রায় ১২১ কোটি মানুষের এই দেশে দশ কোটির বেশি হলেন আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানুষ। আর এই আদিবাসী জনজাতির তৃতীয় বৃহৎ আদিবাসী জনগোষ্ঠী হল সাঁওতাল সম্প্রদায়। সুপ্রাচীনকাল থেকে যাদের চলনে বলনে, জীবনের প্রতি ছত্রে রয়েছে ঐক্য, সংহতি, গণতান্ত্রিক, সাম্যবাদী আদর্শ। জমি-ভূমি রক্ষার লড়াইয়ে এই সম্প্রদায়ও ছিল সামনের সারিতে।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রথম শহিদ বাবা তিলকার উজ্জ্বল উত্তাপ বহন করে সিধু কানুর নেতৃত্বে সাঁওতাল বিদ্রোহ কিংবা ১৮৭৪ সালে ভগীরথ মাঝির নেতৃত্বে খেরওয়াল আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের একেকটি গৌরবময় অধ্যায়। সিধু কানুর নেতৃত্বে ১৮৫৫ সালে সাঁওতালদের কলকাতা অভিযানই ভারতের ইতিহাসের প্রথম গণপদযাত্রা। আদিবাসী সমাজের প্রগতিশীল মানুষই একমাত্র সেদিন স্বদেশি গানের কথা ভাবতে পেরেছিল এবং তাদের ভাষায় সমাজের দুঃখ দুর্দশার কথা গানের মাধ্যমে বৃহত্তর জনসমাজে ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সাঁওতালি জনজাগরণেও সাঁওতালি কাব্য, সাহিত্য, দঙ, লাঙড়ে, পাতা, বাহা, সহরায় প্রভৃতি গান কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সামাজিক সচেতনতায়, পরাধীনতার গ্লানি থেকে মুক্তিলাভে বৃহৎ অংশের মানুষকে উদ্বুদ্ধ করে। রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, কিংবা জ্যোতি বা ফুলে, শ্রীনারায়ণ গুরু, বিরসালিঙ্গম পানতুলুর মতো সাঁওতালি সমাজেও এই সচেতনতা সৃষ্টির কাজে এগিয়ে এসেছিলেন—
(১) সাধু রামচাঁদ মুরমু (১৮৯৭-১৯৫৪) (২) পন্ডিত রঘুনাথ মুরমু (১৯০৫-১৯৮২) (৩) নায়কে মঙ্গলচন্দ্র সরেন (১৮৯৯-১৯৯২) (৪) কবি সারদা প্রসাদ কিস্কু (১৯২৯-১৯৯৬) সহ আরোও অনেকে।

সাধু রামচাঁদ মুরমুর—

"দে বোন তেঁগোন আদিবাসী বীর হো
দে বোন তেঁগোন আদিবাসী বীর....।"

আদিবাসীদের কাছে জাতীয় সঙ্গীতের মতো। কবি সারদা প্রসাদ তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন— "সাধু রামচাঁদের গানের ঢেউ পুরুলিয়ার পাহাড়ি বনে আছড়াইয়া পড়িলে কৈশোরে তিনিও তরঙ্গায়িত হন।" "রামচাঁদ মুরমুআঃ দে বোন তেঁগোন আদিবাসী বীর, অনা তেড়ং হড়কো দুসীউবোনা সেরেঞদ নডেন হড়াঃ লুতুররে তারকোগৎ আকান। সাঁও সাঁওতে উনিয়াঃ সারি ধরম সেরেঞ পুঁথি হঁ সেটের এনা।" (সাহিত্য আন্দোড়রে

পুরুলিয়া জিলীরেণ হড় হপন)

একইভাবে পন্ডিত রঘুনাথ মুরমুর ১৯২৫ সালে অলচিকি লিপি আবিষ্কার এবং হড় সেরেঞ, দাড়েগেধন, রণড়, পীরসি পহা, হিতাল, বিদুচাঁদান, খেরওয়াল বীর প্রভৃতি কাব্য ও নাটক জনজাগরণের একেক শাণিত হাতিয়ার। ডঃ সুহৃদ কুমার ভৌমিক ঠিকই বলেছেন — "অলচিকি আন্দোলনই আদিবাসী সমাজে সর্বাত্মক গণ-আন্দোলনের সুত্রপাত ঘটায় এই আন্দোলনকে গান্ধীর চরখা ও লবণ আন্দোলনে সহিত তুলনা করা যায়।"

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে উচ্চশিক্ষায় শিক্ষিত নায়কে মঙ্গলচন্দ্র তাঁর কাব্যগ্রন্থ ছিতী, ভোটোঃ উপাল বাহা, জম সিম বিন্তী প্রভৃতির মাধ্যমে সাঁওতাল সমাজ ও সংস্কৃতির ঐতিহ্যের পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন।

জাতীয় শিক্ষকরূপে রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত কবি সারদাপ্রসাদ কিস্কুর 'ভুরকী ইপিল', কুহুবাউ, লাহাঃ, হররে, সলম, লটম, জুডাসি অনলমালা প্রভৃতি গ্রন্থ সাঁওতালি জনজাগরণে প্লাবন আনে।

১৭৮০, ১৮৩২, ১৮৩৪, ১৮৫৫-৫৬, ১৮৭৫, ১৮৮০-৮১ এবং ১৯০০ সাল কিংবা আরোও বিভিন্ন সময়কালে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন শোষণের বিরুদ্ধে জাগ্রত চেতনা সৃষ্টিতে তৎকালে রচিত বিভিন্ন সাঁওতালি গান বিশেষ ভূমিকা নেয়।

"বাকো লুতুরাঃখান বাকো হেতাওয়াঃখান
হায়রে হায়রে ভগত্ কেনারাম
নোয়ারাবোন নুসাসা বোন বাংগেকো তেঁগোন
দঃক্ বোন দানাং বোন বাং গে কো রেবন
তবে দবন হুল গেয়া হো"(২)

বাংলা অর্থ

কেউ না শুনলে কেউ গ্রাহ্য না করলে
হায় হায়! ভগত কেনারাম
আমরা নিজেরাই বাঁচব।
কেউ পাশে দাঁড়ায় না-আমাদের সাহায্য আশ্রয় দিতে
কেউ রাজি নয়
তবে আমরা বিদ্রোহই করব।

গানটি১৮৫৫-৫৬ সালের সাঁওতাল বিদ্রোহে বিদ্রোহীদের উজ্জীবিত করতে বীজমন্ত্র

হিসাবে কাজ করে। অধ্যাপক সুহৃক কুমার ভৌমিকের সংগৃহীত গানে ১৮৫৫ সালে বিদ্রোহের সময় সাঁওতালদের কলকাতা অভিযানের তথ্য মেলে।

"সিঞবির সেন্দরাক সেনঃআ
রমঝম তালা ঞিঞদা
কালুকাটা দরবার ক সেনঃ আ
সিঞে সিঞ্ সিঞে ঞিঞদা।"

অর্থাৎ সিঞ বনেতে শিকারে যায় তারা গভীর রাতে রমঝম। কলকাতার দরবারে যায় তারা সারাটা দিন সারাটা রাত।

এমনকি বিদ্রোহী বাজুলকে গ্রেপ্তার করে যখন সিউড়ি হাজতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তখন সিউড়ির কারাগারকে বাজুল সিউড়ি মেলার সাথে তুলনা করেছে; হাতের শিকল পায়ের বেড়িকে বাঁশি,নূপুরের মতো মনে করেছে। সাঁওতালি গানে আছে বিচিত্র সেই অনুভূতির কথা।

"তকয় হুকুমতে বৌজিল তকয় বলেতে
রূপে সিং তাম্বলি দম মাঃ কেদেয়া
সিদু হুকুমতে নায়ো গো কানহু বলেতে
রূপে সিং তাম্বলি দঞ্ মাঃ কেদেয়া।
তি-রেতাম হীড়ি বাজিল জাঁগা রেতাম বেড়ি
নাম দম চালাঃ কানা বাজিল সিউড়ি হাজততে।
তিরেতিঞ্ ত্রিয়ো জাঁগারেতিঞ লিপুর
নিঞ্ দঞ চালাঃ কানা নায়ো সিউড়ি মেলা ঞেল।"

বাংলা অর্থ

কার আদেশে বাজিল কার শক্তিতে
রূপ সিং তাম্বুলিকে তুমি খুন করলে
সিদুর আদেশে মাগো কানুর জোরেতে
রূপ সিং তাম্বুলিকে খুন করেছি।
হাতে হাতকড়ি বাজিল পায়ে বেড়ি
তুমি যাচ্ছ বাজিল সিউড়ি জেলেতে
হাতে আমার বাঁশি মাগো পায়ে পরা নূপুর
যাচ্ছি আমি মাগো সিউড়ি মেলা দেখিতে।

পরিশ্রমী, শক্তিশালী সাঁওতালরা বড়লাট লর্ড বেন্টিঙ্কের সময়কালে ইংরেজদের

আহ্বানে দলে দলে কটক, ধলভূম, মানভূম, বরাভূম, ছোটনাগপুর, পালামৌ, হাজারিবাগ, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বীরভূম প্রভৃতি এলাকা থেকে এসে শ্বাপদ সংকুল জায়গায় বন কেটে পাহাড় ধ্বসিয়ে গ্রামের পর গ্রাম পত্তন করেছিল দামিন-ই-কোহতে। পাথুরে, অনুর্বর, কৃপণ ধরিত্রীকে ভরিয়ে তুলেছিলেন সোনার ফসলে। সাঁওতালদের সেই সময়কার আশা-আকাঙ্ক্ষার অসাধারণ বর্ণনা রয়েছে - চৈতন্য কুমার হেম্ব্রমের লেখায় (সান্তাল পারগানা, সান্তাল আর পাহাড়িয়া কোওয়াঃক ইতিহাস,পৃঃ ৫৭-৫৮।

"হানা ঘুটু, পোর কুটাম
নাওয়া ঘুটু সিয়োঃ ক
লিতাই লিতাই হারটুটি গেল
হামারো ঘরের ঘরণী
দানাপাণি নাই হে
মাঁডি বোকাঃক্ টুটি গেল।
আশ ছুটি গেল
লিতাই লিতাই হার টুটি গেল।"

বাংলা অর্থ

ঐ মাঠে ঝোপ-জঙ্গল কাটতে হচ্ছে
এ মাঠে লাঙ্গল করতে হচ্ছে
নিতে নিতে হাল ভেঙ্গে গেল
আমার ঘরের গিন্নী
দানাপানি নেই
রান্নার হাত ভেঙ্গে গেল
নিতে নিতে হাল ভেঙ্গে গেল।

১৯৪২ এ ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সময়কালে জাতীয় কংগ্রেসের প্রচারে সাঁওতাল এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ত মহাকবি সাধু রামচাঁদ মুর্মুর দেশাত্মবোধক গান।

"দে বয়হা বেরেৎ তাবনপে
জয় চির মা তুল তাবন পে।
বুনিয়াদি বয়হাক মিলন সামেল
মা তেঙ্গোন তাবন পে দোমেল দোমেল"।

বাংলা অর্থ

এসো রে ভাই সবাই উঠেপড়ি,
জয়পতাকা উর্ধ্বে তুলি
আদিবাসী ভাই সব আয় দলে দলে
দাঁড়াও সবাই এই মহামিছিলে।

বাঁকুড়া জেলার তালডাংরা, সিমলাপাল, সারেঙ্গা, রায়পুর প্রভৃতি সাঁওতাল অধ্যুষিত স্থানে ৪২ এর আন্দোলন দুর্বার গতিতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনকে সাঁওতালরা সামান্য আন্দোলন বলে মনে করেনি, এ ছিল তাদের কাছে মুক্তির লড়াই। এক সাঁওতাল কবি 'আকাল যুগী' লিখে গেছেন—

"চালাঃতিঞ্মে বাবা আয়ো রড়ে এহবা আপেরেন আয়ো আলে রঃ নীকিজঃ আলে
বাইরীক সাঁও তুপুৎ আপুম তুলুজ মেঁড়হেঁৎ সাকম হঁলে হরঃ রুওয়ীড়
পেঁড়ে পেঁড়ে আয়োআঃ সারেড়ঃআ মেঁৎ দাঃ কেটেজাকান মনে ধিরি লেকাগে ত অনে
এনহঁঞেঞ্লঃতায়া মচারে মুলুচ্। তিস্গে বাইরী কলে ঞেঞ্লক ইজীড়।
জানাম দিসম আমাঃ জিৎকীর আপুমাঃ দিসম হড়ক হুদিস ঊনিশ'শ বিয়াল্লিশ
জিৎকীর খের্ওয়াল বায়ারকোওয়াঃ সনা আখরতে অল নাগাম মেনাঃ
সিধু কানহু ঞুমাতে হটঃরে সেরমাতে বাংগে হিড়িঞঃ আদ যায়যুগ জেওয়েদঃ
বাইরী হেলেচ্কোপে আঁদাঃ তাওয়াঃ বার্ গেল্ মিৎ আগস্ট রেনাঃ"

অর্থাৎ যাও বাবা সিধু কানহুর স্মরণ নিয়ে শত্রু নিধন কর। তোমাদের মা আমরা পুনরায় পরব, সাজবো। দেশের লোক স্মরণ করে ১৯৮২, সোনা অক্ষরে লেখা ইতিহাস, ভোলা যায় না ২১ আগস্টের কথা।

খেড়্যা বা শবর এবং বিরহড় উপজাতির শ্রুতি সংস্কৃতি ঃ-

এককালের জঙ্গলমহল কিংবা অখণ্ড মানভূমের শাল, পলাশ, মহুয়ায় ভরা জঙ্গলময় দেশের নাম জানা অজানা বিভিন্ন টিলা, পাদদেশে কিংবা কুমারী, কাঁসাই, নেংসাই, সুবর্ণরেখার তীরে তীরে লাল কাঁকুরে উঁচু জমিতে লোকালয় থেকে দূরে নির্জন প্রাকৃতিক পরিবেশে ঐতিহ্যময় বিভিন্ন শ্রুতি সংস্কৃতির পরম্পরা বহন করে পাতায় ছাওয়া কুটিরে থেকে জীবন সংগ্রামে যুঝে চলেছে আর এক আদিম জনগোষ্ঠী— "খেড়্যা" বা "শবর" তাদের নাম। একবিংশ শতাব্দীর হাইটেক সিটির এই দুনিয়ায় আজও এরা সভ্য

মানুষের চোখে জংলী, প্রকৃতিতে বুনো, যাদের গা থেকে এখনও বুনো গন্ধ যায় নি, আজও যারা আদিম মানব— বনভূমির মায়া এখনও যারা কাটাতে পারেনি— এরাই শবরগোষ্ঠীর মানুষ। আজও এরা সমাজবদ্ধ মানুষের সৃষ্টি সভ্যতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়ে নি, সভ্য মানুষের তৈরি বুদ্ধিগ্রাহ্য আইন কৌশলে নিজেদের খাপ খাওয়াতে পারে নি।

লোকালয় থেকে দূরে নদীনালা-বনজঙ্গলে ঘেরা নির্জন বন্য পরিবেশে বসবাস করতে এরা ভালবাসে। কৃষিকাজে এরা এখনো অভ্যস্ত হয়নি। শ্রমিকের কাজও বড় একটা করে না। বন্য নির্ভর জীবিকাই এদের মুখ্য জীবিকা। মাটির মোহ যেমন এদের নেই তেমনি মাটির মায়াও নেই। বেশিদিন এক জায়গায় বসবাসও করে না। পুলিশ বা গ্রামের লোক বেশি বিরক্ত করলে ঘর দুয়ার ছেড়ে অন্য কোথাও পালিয়ে যায়।

বনজঙ্গল থেকে ফলমূল, শিকড় ছাড়াও পাখির বাচ্চা, ঢ্যামনা সাপ, গোসাপ, ব্যাঙ, শামুক প্রভৃতি সংগ্রহ করে এরা খাদ্যের অভাব মেটায়। এদের ঘর বলতে বড় জোর সাত হাত উঁচু, পাঁচ ছ হাত লম্বা চওড়া মাটির অশক্ত দেওয়ালে সামান্যটুকু খড় দিয়ে ছাওয়া। এই কুঁড়ে ঘরের একটি মাত্র দুয়ারে কোন মতে হামাগুড়ি দিয়ে ভেতরে প্রবেশ করতে হয়। বেশভূষায় আদিমতার ছাপ। পুরুষদের দেহে কোমরের নিচে একফালি শতছিন্ন কাপড়। মেয়েদেরও নেই কোন শৌখিনতা। পুরুষদের চেয়ে নারীরাই বেশি সক্রিয় ও বুদ্ধিমতী। পুরুষদেরকে মেয়েরাই পরিচালনা করে।

আদিম এই জনগোষ্ঠীর মানুষরাও আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের জাতীয় সৈনিক। ১৯৪২ সালের ভারতছাড়ো আন্দোলনে মানবাজার, বরাবাজার, বান্দোয়ান, পুঞ্চা, পটমদা যে কটি থানায় এবং মদভাটির উপর সফল আন্দোলন চালানো হয়েছিল সবকটি আন্দোলনে শবরদের আত্মদান সর্বজনবিদিত। লছু শবর, রেবতী শবরদের নাম এ প্রসঙ্গে বিশেষ উল্লেখ্য।

শবরদের আচার-ব্যবহার, রুচি, বৈচিত্র্য, জীবনাচরণ সবই মূলতঃ শ্রুতি নির্ভর। বরাবাজার থানা এলাকার হিঁজলার সন্নিকটে জাহনাবাদ নিবাসিনী সাবিত্রী শবরের গাওয়া গানে ধরা পড়ে সে কথা।

শ্রুতি নির্ভর বিভিন্ন শবর গানে ফুটে উঠেছে তাদের জীবন সংগ্রামের নানান দিক।

"শাকার শাকার পানিক জাম
ডীডি কুডি পাঁড় খাম
কাঠ নাই পতর নাই
ধান নারাই রাঁধুবি

আনাকবে ধুরর কুটুম
খাইগেনাক বাসি বে।
বাংলা অর্থঃ—

সকাল সকাল জলকে যাব
ডাড়ি কুড়ে জল খাব
কাঠ নাই পাত নাই
ধান নাড়াই রাঁধি
আসেছে ধুরের কুটুম
খাঁয়ে গেল বাসি হে।

লোকচক্ষে অন্ত্যজ, পরিত্যক্ত, নিম্নশ্রেণির প্রজাতিরূপে গণ্য হলেও শবর জনগোষ্ঠীর মানুষ তাদের সংস্কৃতি এবং শিল্পচেতনায় বিশেষভাবে সমৃদ্ধ। জীবন জীবিকার জটিল সংগ্রামে এরা পরাভূত নয়। বিখ্যাত শবরশিল্পী প্রয়াত শুকু শবরের পুত্র গুরুচরণ শবরের কণ্ঠে তাই ধ্বনিত হয়—

গটা গাঁ ঘুরু ঘুরু
তাও জুটয় নাই ঋণরে
ড-ভা ঝিটিম দিদি
তাও কাটিম দিন রে।

অর্থাৎ—
গটা গাঁ ঘুরি ঘুরি
তাও জুটে না ঋণরে
ড-ভা ঝিঁটিব দিদি
তাও কাটিব দিন রে।

শবর জীবনের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য হল— হৃদয়ে এদের সরল মন, শরীরে অসুরের শক্তি। এটাই এদের চারিত্রিক সৌন্দর্য। বনে পাহাড়ে, গিরি কন্দরে, নদীনালার তীরে তীরে শবর গানের সুরে আজও শোনা যায় সেই সাহসিকতার অনুরণন—

হামর নাতি ডাগর ছাতি
দুয়ারে বাঁধিনাক হাতি
নাতির সঙ্গে হাম ছাতি কুড়ম্বে (২)

একই সাথে রয়েছে বনের ইতর প্রাণীর উপরেও মমত্ববোধ। আর তাই বনের কুরকুট (এক ধরনের লাল পিঁপড়ে যার ডিম শবরদের প্রিয় খাদ্য) দের দেখেও শবরীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয় সান্ত্বনার গান—

কাঁদস্ কিসক রে কুরকুট
ভাবস্ কিস্ক রে
হোক্ ন রে নওয়া পতর

অর্থাৎ— কাঁদিস কে নে রে কুরকুট
ভাবিস্ কে নে রে
হোক ন রে নতুন পাত

পটম বাঁধিম রে। ঘর বাঁধবি রে।

একইভাবে ভারতের আদিম অধিবাসী (Primitive Tribe Group) বীরহড়রা আজ কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে। হিমালয় পর্বত হতেও প্রাচীন পুরুলিয়া জেলার অযোধ্যা পাহাড়ে এবং ঝালদা ১নং ব্লকের হেঁসাহাতু অঞ্চলে যুগে যুগে বাস করে আসছে এই বীরহড় সম্প্রদায়। এককালে তাঁদের ভাষা সংস্কৃতি ছিল, এখন প্রায় অবলুপ্ত। ঘাটশিলা কিংবা অযোধ্যার পাহাড়তলিতে শুধু শোনা যায় তাঁদের অস্তিত্ব রক্ষার করুণ সুর—

"আলে দ লে বিরহড় হেকে
সাকাম কুঁবা অড়া: তালে
বিরহাঁসের জম তেলে তাঁহে কিনালে।
বুরুনাড়ি রাপা: এনা
বিরহড় হঁবন চাপা: কানা।
বিরবুরু তাঁহেরেদ হড় মেনা: বনা।
বিরবুরু চাবায়েনা টাঁড়ি গেলে আঁড়গুএনা
নেস খনদ সরকাররেন হড়লে লেখায়েনা।"

অর্থাৎ—

আমরা সবাই বিরহড় বটি পাতার কুঁবা ঘরে থাকি
বনের আলু খেয়ে মোদের দিন চলে যায়।
বন পাহাড় পুড়ে গেল বিরহড়রা শেষ হল
বড় পাহাড় ছিল বলে আমরা ছিলাম বেঁচে।
বন পাহাড় শেষ হল মাঠে আমরা এলাম নেমে
এখন থেকে সরকারের লোক গণ্য হলাম।

উপসংহার ঃ— প্রখ্যাত ঐতিহাসিক শ্রী হরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন—

"We talk of Gandhi and Jawaharlal
Of Matilal, Tilak and the rest
But never of these men,
Who bared their breast
To bullets brave, necks to the swinging rope...."

একথা সর্বৈব সত্য, আমরা শুধু গান্ধী, জওহারলাল, মতিলাল, তিলকের কথাই বলি কিন্তু বুলেটের সামনে যারা বুক পেতে দিয়েছিল, ফাঁসির দড়িতে যারা প্রাণ দিয়েছিল, ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অমর কাহিনি থেকে তাদের কথা বাদই থেকে গেছে।

ভারতবর্ষ নামক দেশে শতকরা প্রায় ছ-ভাগের উপর যে অগণিত মানুষ সেই আদিবাসীদের সম্বন্ধে প্রকৃত জিজ্ঞাসা, আগ্রহ ও সৌহার্দ্যের অভাব আমাদের যে কবে ঘুচবে, কে জানে?

তথাকথিত কিছু শহুরে বাবুদের দৃষ্টিতে এরা পুরোপুরি সভ্য নয় ঠিকই কিন্তু এই দেশটির প্রতিটি ধূলিকণা এদের কাছে পবিত্র। এর প্রতিটি পাহাড়-পর্বত, প্রতিটি উপত্যকা, প্রতিটি সমভূমি, জল-জঙ্গলের সঙ্গে কোন না কোন সুখাস্মৃতি, কিংবা বেদনার কোন করুণ কাহিনি মিশে আছে।

রাত্রি আর দিন তো একসঙ্গে থাকতে পারে না। যেভাবে পাহাড়ের গায়ে লেপটে থাকা কুয়াশা প্রখর তপন-তাপের আবির্ভাবে দূরে অপসৃয়মান হয়, তেমনিভাবেই জোতদার, জমিদার, ভূস্বামী-মহাজন তথা দিকুদের অত্যাচারে চিরকালই এরা পালিয়ে বেড়িয়েছে, কেউবা নাগপুর থেকে আবার কেউবা দামোদর তীর কিংবা চাইগাড়, চাম্পাগাড় তথা হাজারিবাগ এলাকা থেকে।

অথচ আমরা জানি ১৭৫৭ সালের পরবর্তীকালে ভারতবর্ষে যত ঔপনিবেশিক বিরোধী লড়াই সংগ্রাম হয়েছে তার প্রথম সারিতে ছিলেন এরাই। সদ্যোজাত শিশু যেভাবে তার মাতৃহৃদয়ের দপদপানি ভালোবাসে, সেভাবেই এরা এই ভারতের মাটিকে ভালোবাসে। আর এ কারণেই এই মাটি ও ফসলকে রক্ষার জন্য এরা কেউ 'হুল' কেউবা ঘোষণা করেছে 'উলঘুলান'।

আজ যখন পাহাড়ি এলাকাগুলোয় উপজাতিদের হাজার হাজার নালিশ জড়ো হওয়ার খবর আমরা পাই তখন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে এই বুভুক্ষু মানুষদের জন্য কিছু প্যাকেজ ঘোষণা করেই আমরা আমাদের মহান দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করি। ঐক্য ও সংহতির ললিত বাণী তাদের শোনাবার চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা ভুলে যাই সাঁওতাল উপজাতির প্রথম গীত গান—

"মুচ্‌ক্ মুচ্‌ক্ দক দুগুৎ দুঁগুদঃ
চাঁপাকিয়ো বাড়ে লাতার ডাহাররেক দুঁগুৎ দুঁগুদঃ।"

(অর্থাৎ- পিঁপড়েরা চাঁপাকিয়ে বটগাছের নিচে সারিবদ্ধ হয়ে চলেছে)। এই ডাহার গান, বাহা, সহরায়, মুন্ডাদের সারুল প্রতিটির ছত্রে ছত্রে রয়েছে ঐক্য, সম্প্রীতি আর সৌভ্রাতৃত্বের কথা। স্বাধীনতার পর এক এক করে ৬৪টি বর্ষা বাদল পেরিয়ে গেলেও কি কেন্দ্রীয় কি রাজ্য কোন সরকারই জঙ্গলমহলের এই আন্তরিক আবেগের প্রকৃত মূল্যায়ণ করে নি। ছোটবেলায় প্রচলিত একটি ছড়ায় পড়েছিলাম—

"আগডুম বাগডুম, ঘোড়াডুম সাজে
বাজাতে বাজাতে চলল ডুলি.....

বলা হয়— 'আগে ডমনা, পরে বামনা'। রাজা, জমিদাররা এককালে এই লড়াকু ডোম সম্প্রদায়কে ঢাল হিসাবে সামনে রেখে যুদ্ধে বিপদ থেকে উদ্ধার পেত। জঙ্গলমহলেও তেমনি বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কম বেশি প্রায় প্রত্যেকটি রাজনৈতিক দলই বিভিন্ন স্বার্থান্ধ গোষ্ঠী, নৈরাজ্যবাদীরা আদিবাসী সম্প্রদায়কে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে, কেউবা ভোটের আগে এদের জন্য মায়াকান্না কেঁদে রাজগদী দখল করেছে কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার পর সেই সিঁড়ি ব্রাত্যই থেকে গেছে - বরঞ্চ হয়েছে করুণা, ঘৃণা ও জিঘাংসার পাত্র।

আদিবাসীদের কৌমভিত্তিক জীবনধারাকে প্রথমদিকে ব্রিটিশরাও গুরুত্ব দিয়েছিল— এ কারণেই বিভিন্ন ঘাট পাহারার জন্য কোথাও ঘাটোয়াল, তরফদারদের তারা নিয়োগ করেছিল। কিন্তু স্বাধীনতার পর এদের এই গোষ্ঠীগত জীবন, সামাজিক বিন্যাস, আতু মড়ে হড়, মাঝি, পারাণিক, জগমাঝি, গডেৎ, ভদ্দ কিংবা মুন্ডা, মানকিদের যথাযথ মর্যাদা রক্ষিত হয় নি। এই মাঝি, পারাণিক, মুন্ডা, মানকিরা সকলেই যে সামন্ত বা আধা সামন্ত শ্রেণির প্রতিনিধি, ঘটনা সেটাও নয়— আসলে এদের সামাজিক সংস্কৃতির ঐক্যের সুরটা অনুধাবন করার ক্ষেত্রেই আছে ঘাটতি। পশ্চিমবাংলায় ভূমিসংস্কার এবং পঞ্চায়েতি ব্যবস্থার বিকেন্দ্রীকরণের ফলে জঙ্গলমহলের আদিবাসী শ্রমজীবী মানুষ মাথা তুলে দাঁড়াবার অধিকার পেয়ে জীবনে চলার গতি পেয়েছে— একথা ঠিক। কিন্তু তথাপি প্রকৃত ক্ষমতা রয়েই গেছে দেশীয় শোষক তথা তথাকথিত সেই দিকুদের হাতে। প্রকৃত ক্ষমতা বা নীতি নির্ধারকের ভূমিকায় আসতে পারলেন না বলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই উন্নয়নের স্রোতে নিজেদের অংশীদার করতে পারলেন না পদদলিত মানুষ।

অন্যদিকে দেশীয়, আন্তর্জাতিক বহুজাতিক কোম্পানীগুলির ভাগাড়ে পরিণত হওয়ায় জঙ্গলমহলের কি দামোদর কি সুবর্ণরৈখিক সভ্যতাকে ভেঙ্গে খান খান করা হয়েছে। স্বদেশি আমল থেকেই জামশেদপুরে, বার্ণপুরে, ধলভূমে কিংবা বোকারোতে কোথাও লৌহইস্পাত, কোথাও বৃহৎ বৃহৎ জলাধার নির্মিত হলেও জঙ্গল এলাকার মানুষের ক্ষতিপূরণ বা চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে রয়েছে বঞ্চনা। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ আমল থেকে শুরু করে অদ্যাবধি জঙ্গল এলাকার অফুরন্ত খনিজ ভান্ডার লুঠতরাজ এর কাজ যেমন চলছে তেমনি এই এলাকার চিরায়ত এবং গর্বের বিভিন্ন লোকশিল্প ছৌ, নাটুয়া, ঝুমুর, টুসু, নাচনি শিল্পকে ভর করে দেশি, বিদেশি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রী অর্জন করা সহজ। কিন্তু চলচিত্রের জন্য যখন কোটি কোটি টাকার ব্যয় বরাদ্দ তখন শলাবৎ মাহাত, হাড়িরাম কালিন্দী, বিজয় মাহাতরা বুভুক্ষু থাকলেও তাদের খবর নেওয়ার লোক ক'জন? জঙ্গল এলাকার যে ঝুমুর, টুসু, ভাদু স্বদেশি আমলের বহু আগে মানুষকে জাগ্রত চেতনা

দিয়েছিল তার বিকাশে সরকারি ব্যয়বরাদ্দ কতটুকু? বরঞ্চ তার পরিবর্তে যুবশক্তিকে খতম করার লাস্য নৃত্যের হাতছানি। জীবন যন্ত্রনা হতাশায় নিমজ্জিত যুবকেরা কারো প্ররোচনায় হাতে অস্ত্র তুলে নিলে দোষ দেবেন কাকে? অন্যদিকে বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের এই যুগে বিভিন্ন দেশি বিদেশি বিজ্ঞাপন সংস্থা এবং টিভি চ্যানেলগুলি দেশে বিদেশে ছো তথা গ্রামীণ লোকশিল্পকে ব্যবহার করে লক্ষ লক্ষ টাকা রোজগার করলেও প্রকৃত শিল্পীরা রয়েছেন সেই তিমিরেই।

জঙ্গলমহল তথা মানভূমের কষ্টসহিষ্ণু, সরল অথচ পরিশ্রমী মানুষ লক্ষ কোটি টাকার স্বপ্ন দেখে না; একমাত্র মান, সম্ভ্রম, মর্যাদাই তাদের মূলধন। বাবা তিলকা, সিধু, কানু, চাঁদ, ভৈরব, বিরসা, জিলপার বংশধরদের "মানুষের অধিকারে বঞ্চিত....." হতে হয়েছে বার বার। তাই সহানুভূতি নয়, চাই সমানানুভূতি। শুধু প্যাকেজ ঘোষণা কিংবা ভোট ব্যাঙ্ক হিসাবে ব্যবহার করা নয় আদিবাসী উন্নয়নে চাই কার্যকরী আন্তরিক প্রয়াস। মৌঝি মাপাজি সহ সমস্ত স্তরের গ্রামীণ সংগঠনগুলিকে পঞ্চায়েত ও উন্নয়নের কর্মযজ্ঞে মর্যাদা সহকারে যুক্ত করা জরুরি। ঐতিহ্য-পরম্পরায় ভরপুর গ্রামীণ লোকশিল্পের যথাযথ বিকাশের জন্য চাই সুচিন্তিত পরিকল্পনা।

"পুরুল্যার ছাঁটা চাল বঁধু, বালি ঝরা জল
টপকি টপকি পড়ে দু নয়নে লর...."।

ছাঁটা চাল, বালি ঝরা জল এই হল জঙ্গলমহলের সংগ্রামী মানুষের সংগ্রামী চেতনার সুর। 'শা বনে কুহুদেলায়' এই সংগ্রামী চেতনা নিয়েই বিগত দিনে এখানকার ভূমি সন্তান একলব্যরা একদিন মুসলিম সাম্রাজ্যবাদ থেকে শুরু করে ব্রিটিশ রাজসিংহকে পদানত করেছে। এই সংগ্রামী চেতনা দিয়েই আগামী দিনে গড়ে উঠুক এক সুন্দর শোষনহীন জঙ্গলমহল এটাই কামনা।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। শ্রী শলাবৎ মাহাত

২। শ্রী মিহিরলাল সিংদেও

৩। শ্রী চৈতন মাহাত

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী ঃ-

১) কালের প্রেক্ষাপটে ঝুমুর ও স্বরলিপি - মিহিরলাল সিংদেও।

২) দেবপ্রসাদ জানা সম্পাদিত - অহল্যাভূমি পুরুলিয়া (১ম খন্ড)।

৩) পশ্চিমবঙ্গ- পুরুলিয়া জেলা সংখ্যা।

৪) পুরুলিয়া জেলা পঞ্চদশ বইমেলা ২০০০ - ২০০১ স্মারক গ্রন্থ।

৫) প্রসঙ্গ - রাঢ় গবেষণা - আচার্য কীর্তানন্দ অবধূত।

৬) মানিকে ভরা মানভূম - জলধর কর্মকার, রবি ব্যানার্জী।

৭) জঙ্গলমহল রাঢ়ভূম ও ঝাড়িখন্ডের ভূমি ব্যবস্থা, সংস্কৃতি ও সংগ্রামী ইতিহাসের রূপরেখা - পশুপতিপ্রসাদ মাহাতো।

---

* প্রবন্ধকার পুরুলিয়ার বলরামপুর ফুলচাঁদ উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা করেছেন।